লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের
পঞ্চায়েত বার্তা
পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ০৯ ● ১লা আগষ্ট ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

ত্রিস্তর সূচি

বার্তা প্রতিনিধি: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করবে ৮ আগষ্ট। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের জন্য ১০ আগষ্ট। তার পর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন হবে ১৬-২০ আগষ্ট। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন হবে ২২-২৩ আগষ্ট। জেলা পরিষদ গঠন ও সভাধিপতি নির্বাচন হবে ২৬-২৭ আগষ্ট।

কড়া প্রশাসন

বার্তা প্রতিনিধি: নাবালিকা মেয়ের বিয়ে রুখে দিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিলেন নদীয়া জেলার রানাঘাট ১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। ৩০ জুন তাহেরপুর থানার বারাসাত গ্রামে ১৩ বছর বয়সের একটি মেয়ের বিয়ে আটকে দিতে সটান মেয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হন রানাঘাট ১ ব্লকের বিডিও। মেয়েটিকে উদ্ধার করে চাইল্ড লাইনে রাখা হয়েছে।

বেহাল রাস্তা

বার্তা প্রতিনিধি: হুগলী জেলার তারকেশ্বর ব্লকের সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সাহাপুর থেকে চাঁদুড় কালীতলা পর্যন্ত মোরাম বিছানো রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। অথচ প্রতিদিন প্রচুর গ্রামবাসীকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এই রাস্তার উন্নতি ঘটাতে পারলেও সে ব্যাপারে কোনওরূপ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এমনকি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এই রাস্তাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রাস্তার উন্নয়নের ব্যাপারে গ্রামের মানুষ এখন পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অবিলম্বে রাস্তা সারাইয়ের ব্যবস্থা না নিলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়বে।

মহিলা অধিকার

বার্তা প্রতিনিধি: গোয়ার পঞ্চায়েত মন্ত্রী লক্ষীকান্ত পারশেখর রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলিকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন পঞ্চায়েত যদি মহিলা সদস্যদের সরপঞ্চ হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রশাসনিক পদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত চায় তবে সেই পঞ্চায়তেকে বাতিল করে দেওয়া হবে।

জয়ী হল জলাভূমি

বার্তা প্রতিনিধি: ভরাট করা জলাভূমি ফের খুলে দিয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে কাটোয়ার পরিবেশ কর্মীদের মনে এখন খুশির হাওয়া। ঘটনাটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া স্টেশনের কাছাকাছি। সাতাশ কাঠার শরিকি মালিকানাধীন একটি জলাভূমি প্লট করে বিক্রির উদ্দেশ্যে মালিকরা ১৯৯৩ সালে জলাটি ভরাট করতে শুরু করেন। অথচ এলাকার সুষ্ঠ নিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই জলাভূমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় বাসিন্দারা জলা ভরাট বন্ধের জন্য পুরসভা ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন জানালেও তারা তাতে আমল দেয়নি। ফলে জলা ভরাটের মত বেআইনি কাজও বন্ধ করা যায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গরীবের নতুন সংজ্ঞায় হতবাক অনেকেই

বার্তা প্রতিনিধি: যোজনা কমিশনের গরীব কমানোর নতুন সংজ্ঞায় অনেকেই অবাক হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব যোজনা কমিশনের এই গরীব নির্ধারণের নতুন সংজ্ঞার বাস্তবতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন তেমনি বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্বরাও যোজনা কমিশনের গরীবের এই নতুন সংজ্ঞার আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছেন। শহরের কোন মানুষের সারাদিনে ৩৩.৩০ পয়সার বেশি খরচ করার সামর্থ না থাকলে তবেই তিনি গরীব বলে চিহ্নিত হবেন। আর গ্রামে যে সমস্ত গ্রামবাসীর ২৭.২০ পয়সার বেশি খরচ করার সামর্থ নেই তারাই গরীব হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন। উক্ত সংজ্ঞার নিরিখে হিসেব করলে শতাংশের হিসেবে ভারতে গরীবের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২১.৯ শতাংশ।

যোজনা কমিশনের এই নতুন সংজ্ঞাকে অবাস্তব বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ভারী শিল্পমন্ত্রী সহ অনেক রাজনৈতিক দল। এই দুর্মূল্যের বাজারে শহরে ৩৩ টাকা এবং গ্রামে ২৭ টাকার বেশি খরচের ক্ষমতা থাকা কোন ব্যক্তিকে গরীব বলে চিহ্নিত করা হবে না- কমিশনের এই হিসেব সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অযৌক্তিক বলে অধিকাংশ মানুষের অভিমত। কারণ শহরে ৩৩ টাকা এবং গ্রামে ২৭ টাকায় কোন ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব এবং বর্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এধরনের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন অনেকেই। সাধারণ গরীব মানুষের বেঁচে থাকার দৈনন্দিন লড়াইয়ের খোঁজ খবর না রাখার কারণে সমাজের উঁচুতলার মানুষরা ঠান্ডা ঘরে বসে এমন হিসেব কষতে পারেন বলেই মনে করেন সাধারণ মানুষরা। সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকার গরীব মানুষদের নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারেন একটি মানুষের জীবনধারণের পক্ষে ৩৩ বা ২৭ টাকার যুক্তি কতটা হাস্যকর। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, যোজনা কমিশনের

এরপর পাঁচের পাতায়

আই সি ডি এস

তেল ব্যবহারে সতর্কতার নির্দেশ

বার্তা প্রতিনিধি: বিহারের ছাপড়া জেলায় মিড ডে মিল কান্ডের প্রেক্ষিতে নড়েচড়ে বসল পশ্চিমবঙ্গের শিশু কল্যাণ দপ্তর। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের রান্নায় যাতে আগ মার্কা ভোজ্য তেল ব্যবহার করা হয় তার জন্য মহাকরণ থেকে জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার গোডাউন থেকে চাল সরবরাহ করা হলেও অন্যান্য উপকরণগুলি স্থানীয়ভাবে কিনতে হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে খাবারের মাথাপিছু বরাদ্দ সব জেলায় এক নয়। বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বীরভূমসহ ৮টি জেলার বরাদ্দ সাধারণ শিশুদের জন্য ৬টাকা, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য ৯টাকা এবং সন্তান-সম্ভবা মহিলাদের জন্য ৭টাকা। অন্য ৯টি জেলায় মাথাপিছু বরাদ্দ হল, সাধারণ শিশুদের জন্য ৪টাকা, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য ৬টাকা এবং সন্তান-সম্ভবা

এরপর ছয়ের পাতায়

হাসপাতালের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে ধরধরা

জয়ন্ত দাস: জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসা বর্জ্য ধরধরা নদীতে মেশার ফলে নদী দূষিত হয়ে পড়েছে। রক্তমাখা তুলো, গজ, ব্যান্ডেজ, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ এমনকি অপারেশনের পর মানব দেহের কাটা অংশও হাসপাতালের পেছনে নদী সংলগ্ন এলাকায় ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি নদীর জলও দূষিত হচ্ছে। তিস্তার উপনদী হওয়ায় ধরধরার এই দূষিত জল তিস্তা নদীকেও দূষিত করে চলেছে। নদীতে স্নান করার ফলে বহু মানুষের চর্মরোগ হচ্ছে। চিকিৎসা বর্জ্য পদার্থ থেকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।

স্থানীয় মানুষরা এই দূষণের ব্যাপারে সুপারকে জানিয়েও কোন ফল পাননি। সুপার জানান, চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহ করার জন্য শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করা রয়েছে। আর ঘরোয়া বর্জ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব জলপাইগুড়ি পৌরসভার। পৌরসভার সাফাই বিভাগের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা বর্জ্য এবং ঘরোয়া বর্জ্য একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলার ফলে পৌরসভা বর্জ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। স্বাভাবিকভাবে বেসরকারি সংস্থা বনাম পুরসভার ঠান্ডা লড়াইয়ের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন: সিংহভাগ আসনে জয়ী শাসকদল

বার্তা প্রতিনিধি: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের পাল্লাই ভারী হল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেক পেছনে ফেলে তিনটি স্তরেই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ত্রিশঙ্কু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো কাদের হাতে থাকবে সেটা জানতে আরও চার পাঁচ দিন সময় লাগবে।

দল	গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ
তৃণমূল	১৭৪৫	২১৪	১৩
বামফ্রন্ট	৬৯১	৬৬	১
কংগ্রেস	২৩০	২২	১
অন্যান্য	২৯	-	১
ত্রিশঙ্কু	৪৬৩	২৭	২

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

মিড ডে মিল:সতর্কতা জরুরী

যে কোন ছোটখাটো ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা না করা বা আমল না দেওয়া ভবিষ্যতে যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে তা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল বিহারের ২৩জন শিশু। 'মিড ডে মিল' জনিত এই দুর্ঘটনা যে প্রথম ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। গত বছরও উড়িষ্যায় খাবারে ভেজালের ফলে ২৮জন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তামিলনাড়ুতে 'মিড ডে মিল' এর বিষক্রিয়ায় প্রায় ১০০ জন শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হওয়ার নজির রয়েছে। সুতরাং মিড ডে মিলকে ঘিরে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা অস্বীকার না করে উপায় নেই। আমরা সবাই এব্যাপারে একমত যে 'মিড ডে মিল' এর ফলে ভারতে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধির পিছনে 'মিড ডে মিল' এর রূপায়ণ অনস্বীকার্য হলেও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো যদি জরুরী ভিত্তিতে সংশোধন করা না যায় তাহলে এ ধরনের দুর্ঘটনার দায় থেকে কোনও দিনই মুক্ত হওয়া যাবে না।

আসলে ভারতবর্ষের ৬ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রামের 'মিড ডে মিল' প্রকল্পটি দাঁড়িয়ে আছে দুর্নীতি ও অবহেলার উপর ভর করে। যেহেতু দারিদ্রের একেবারে তলানিতে থাকা অভুক্ত ছেলেমেয়েরাই এই মিলের বড় অংশীদার, তাই যে কোনওভাবে রান্নার ব্যবস্থা হলেই হল। দুপুরের দু'মুঠো অবহেলার অন্নই তাদের কাছে পরম তৃপ্তির হবে, আমরা অনেকেই কমবেশি এই মতের অংশীদার।

বিহারের সারন জেলার মশরখ ব্লকের গন্দামন গ্রামের ধর্মসতী স্কুলের এই দুর্ঘটনাটি না ঘটলে আমরা জানতেই পারতাম না কতখানি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এই 'মিড ডে মিল' তৈরি হয়। হয়তো কীটনাশক মেশেনা বলেই বাচ্চাগুলো প্রাণে বেঁচে থাকে, বিসর্জনের খবর হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, মিড ডে মিলের রান্না কিভাবে হবে, কোথায় হবে প্রভৃতি বিষয়ে নির্দেশিকা থাকলেও তা না মানার রেওয়াজই প্রচলিত। যেমন, খোলা জায়গায় রান্না করা যাবে না, খোলা তেল ব্যবহার করা যাবে না, চাল-ডাল রাখার জন্য উপযুক্ত পরিস্কার পাত্র ব্যবহার করতে হবে এবং এর পাশাপাশি পুরো ব্যবস্থাটি ঠিকভাবে চলছে কিনা তা 'মিড ডে মিল' এর কমিটি নজর রাখবে। কাগজ-কলমের এই নীতি নির্দেশিকাকে বাস্তবে প্রয়োগ করাটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিক সদিচ্ছার - সরকারি স্তরে যার অভাব অত্যন্ত প্রকট। 'মিড ডে মিল' প্রকল্প রূপায়ণে ত্রুটি বিচ্যুতির তালিকাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। আর এটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের দেখা যায় না। আর এই গয়ংগচ্ছ ভাবের ফলেই 'মিড ডে মিল' নিয়ে আসে মৃত্যুর পরোয়ানা। 'মিড ডে মিল'এর সুষ্ঠু রূপায়ণে যদি সরকারি কর্তাব্যক্তিদের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকত তাহলে স্কুল পড়ুয়া এই সমস্ত শিশুদের রান্নার জিনিসপত্র তথা চাল, ডাল, শাক সবজি প্রভৃতি খোলা জায়গায় পড়ে থাকত না। ইদুর, আরশোলা, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খেতে হত না। তাদের পাতে পড়তো না পোকা চালের ভাত। টিকটিকির দেখাও মিলত না রান্না করা খাবারে।

গাফিলতি বা ভুল শোধরানোর সময়ের যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে এখনই। সবচেয়ে জরুরী হল 'মিড ডে মিল' এর গুণমান সুনিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত কর্মী ও অর্থের যোগান, যা একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আরও প্রয়োজন, পালা করে ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন অভিভাবককে নিয়মিতভাবে 'মিড ডে মিলে'র তত্ত্বাবধানে রাখা, যাতে তারা রান্নার সময় ত্রুটি বিচ্যুতি ও অনিয়মগুলো ধরতে পারেন। আসলে ঘটনা ঘটার পরেই আমাদের সচেতনতা বাড়ে। মানুষের বিশেষত: গরীবদের প্রতি দায়িত্ব পালনে চরম হেলাফেলা, তাদের অধিকারের প্রতি অশ্রদ্ধা সমাজ জীবনে যে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ছাপড়ার 'মিড ডে মিল' কান্ড তো তার অনিবার্য পরিণতি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমরা এখনও 'মিড ডে মিল' নামক শিশু পড়ুয়াদের এই পুষ্টি প্রকল্পটিকে দায়িত্বের সাথে পরিচালনা না করে দায় ভেবেই চলেছি। ভবিষ্যতে আরও কত মৃত্যুর নি:শব্দ প্রহর গুণতে হবে কে জানে?

গ্রামের ছেলেমেয়েরা অনেকেই দারিদ্রের চাপে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অভাব অনটনের সংসারে বাঁচার তাগিদে চারদিকে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। আবার মেয়েদের বিয়ে হবার পরও পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। অথচ এই সমস্ত মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই পড়াশোনার ইচ্ছে থাকে। অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আবার কেউ কেউ কাজকর্মের ফাঁকে বাড়ীতেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকে। এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও পেতে পারে মাধ্যমিক পাশের সুযোগ। নানা কাজের ফাঁকেও শিক্ষাকে যারা আঁকড়ে ধরতে চায় তাদের জন্য ***নাসিরুদ্দিন গাজীর*** *প্রতিবেদন-*

মুক্ত শিক্ষার অঙ্গনে

উদ্দেশ্য: 'সকলের জন্য শিক্ষা' - এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে প্রথাগত শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ঘটানো হয়েছে। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা আর্থ-সামাজিক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতায় যথাযথ বয়সে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি বা এখনও পারেন না। তাদের সকলের কাছে শিক্ষাকে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই মুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৭ সালে 'রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়' নামে নিবন্ধীকৃত হয়। ২০০১ সালের আগস্ট থেকে এই বিদ্যালয় একটি বিধিবদ্ধ সংস্থার রূপ পেয়েছে। ২০০২ এবং ২০০৬ সালে 'রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়' আইনের কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে ১লা জানুয়ারি ২০০৭ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ' নামে অভিহিত হয়েছে।

'স্বশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত সংযোগ' এর পদ্ধতিতে পরিচালিত এই ব্যবস্থা প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প নয়, পরিপূরক। নবসাক্ষর, প্রথাগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী, কর্মহীন অথবা স্বনিযুক্ত যুবক-যুবতী, পূর্ণ বা আংশিক সময়ের কর্মী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা, প্রতিবন্ধী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীই মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। এদের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে কিছুটা শিথিল এবং নমনীয় নিয়মবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অন্তত: মাধ্যমিক পাশের তকমাটুকু পেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির যোগ্যতা: যারা প্রথাগত বিদ্যালয়ে অন্তত: অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে বা নিজেদের চেষ্টায় ঘরে বসে ওই মান পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তারা 'পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে' ভর্তি হবার যোগ্য। বয়স কমপক্ষে ১৪ বছর হওয়া চাই। বয়সের কোন ঊর্ধ্বসীমা নেই।

কোথায় ভর্তি হতে হবে: 'পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদে'র অধীনে সারা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় পাঠকেন্দ্র ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার্থী তার সুবিধামত এর যে কোনও একটি পাঠকেন্দ্র নাম লেখাতে পারে।

ভর্তি হতে কি কি প্রয়োজন: (ক) বয়সের প্রমাণ স্বরূপ - (১) পূর্বে কোনও অনুমোদিত প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকলে, ভর্তির রেজিস্টার থেকে যে বয়স উল্লিখিত অথবা (২) সরকার অনুমোদিত হাসপাতাল থেকে অথবা (৩) পৌর প্রতিষ্ঠান কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে (নির্দিষ্ট ফর্মে) প্রাপ্ত জন্ম তারিখের শংসাপত্রের নকল সরকারের প্রথম শ্রেণীর আধিকারিক অথবা অনুমোদিত বিদ্যালয়/ মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ এর দ্বারা প্রত্যয়িত করে দিতে হবে। (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে (১) কোনও অনুমোদিত প্রথাগত বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে, সেই বিদ্যালয়ের প্রধানের কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণী পাশের শংসাপত্র অথবা (২) ওই মান পর্যন্ত স্বশিক্ষিত হলে, শিক্ষার্থীর নিজের লিখিত বিবৃতি গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঠ্য বিষয় নির্বাচন: মাধ্যমিকস্তরে মোট ১১টি বিষয় আছে। যথা - (১) বাংলা (২) ইংরেজী (৩) গণিত (৪) ভৌতবিজ্ঞান (৫) জীবন বিজ্ঞান (৬) ভূগোল (৭) ইতিহাস (৮) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৯) অর্থনীতি (১০) গৃহবিজ্ঞান (১১) বাণিজ্য শিক্ষা।

শিক্ষার্থী এই বিষয় তালিকা থেকে ৭টি আবশ্যিক বিষয় (যথা - বাংলা, ইংরেজী, গণিত, ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল) নিয়ে ভর্তি হবে। আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও একটি অতিরিক্ত বিষয় নিতে পারে।

শিক্ষাকাল ও পরীক্ষা ব্যবস্থা: যে শিক্ষার্থী এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন ভর্তি হবেন পরের বছর সেই সময় উক্ত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসতে পারবেন। অর্থাৎ শিক্ষাকাল এক বছর। ভর্তির সময় জুন ও ডিসেম্বর অর্থাৎবছরে ২ বার।

'পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় সংসদ' থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা আবার এই সংসদের অধীনেই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভর্তি হতে পারবে। তাছাড়া এই সংসদ থেকে পাশ করে 'পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ' স্বীকৃত যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভর্তি হতে পারবে।

ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থী যে ক'টি বিষয় নির্বাচন করবে সব ক'টিতে একবারে পরীক্ষা দেবার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। সব বিষয়ে একসঙ্গেও পরীক্ষায় বসা যায়। আবার শিক্ষার্থী তার প্রস্তুতি বুঝে পর পর পাঁচ বছর ধরে বছরে দু'বার করে মোট ৯ বার পরীক্ষা দিয়ে তারা নির্বাচিত বিষয়গুলিতে পাশ করতে পারে। প্রতি বিষয় পাশ নাম্বার ৩৪।

দৃষ্টিহীন এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীর জন্য লেখক নিয়োগ: পরীক্ষার অন্তত: ১ মাস আগে পাঠকেন্দ্রের সঞ্চালকের নিকট নির্দিষ্ট নির্দেশে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ সহায়ক চেয়ে দরখাস্ত দিতে হবে। 'লেখক' অনুমোদিত হলে তা পাঠকেন্দ্রের সঞ্চালককে চিঠির মাধ্যমে সংসদের দপ্তর থেকে জানানো হবে। সঞ্চালক অনুমোদিত লেখকের নাম ঠিকানা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিচালককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন।

ভর্তি, পরীক্ষা ও অন্যান্য ফি: (১) ভর্তি ফি ১৫০ টাকা (২) বিষয় ফি-প্রতি বিষয়ের জন্য ১০০ টাকা (৩) মহিলা তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনও ভর্তি ফি লাগবে না (৪) ভর্তির আবেদন পত্রের নিদর্শন সহ প্রসপেকটাস সবার ক্ষেত্রে ২৫ টাকা (৫) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে ১৪-১৮ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কোনও অর্থ দিতে হবে না। এই শিক্ষার্থীদের টাকা ব্লক গ্রান্ট থেকে যাবে। সমস্ত বইপত্র শিক্ষাকেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে।

অবৈধ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের রমরমা

চিঠি পত্র বিভাগ
(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুসারে জানা গেল, জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে কোনও বৈধ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব বা কালেকশন সেন্টার নেই। ১৪/০৭/২০১২ তাং একটি সংবাদপত্রে 'অবৈধ ল্যাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা' শিরোনামে একটি খবর রয়েছে। খবরের ভাষ্য অনুসারে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে প্রচুর অবৈধ প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী গজিয়ে উঠছে বলে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মহোদয় শুনেছেন? ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নাকি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটগুলি পরীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটগুলি কোন দপ্তরের ইস্যুকৃত? রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজনদের, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নাকি পরামর্শ, বৈধ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করানো। অবৈধ ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা সঠিক হয় না। এই ধরনের ল্যাবরেটরীর রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসা হলে অনেক সময় রোগীর বিপদ হতে পারে।

আমার প্রশ্ন হল, সাধারণ মানুষ বৈধ ল্যাবরেটরী চিনবেন কি করে? এর জন্য কি নির্দিষ্ট কোন নির্দেশিকা রয়েছে? ভূত কি তবে সর্ষের ভেতরেই? জনমনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকি মারছে।

তপন চন্দ
গ্রাম ও পোষ্ট : মাদারিহাট
জলপাইগুড়ি - ৭৩৫২২০

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা, করেছিনু আশা। গ্রাম বাংলায় এমন অনেক পরিবার আছে যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। আবার এমনও অনেক পরিবার আছে যাদের এক চিলতে জমি থাকলেও তাতে বাড়ী তৈরির মত সামর্থ নেই। আমরা অনেকেই ইন্দিরা আবাস যোজনার কথা জানি। কিন্তু তাছাড়াও গৃহহীন, নিরাশ্রয়, অসহায় মানুষদের জন্য রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তরের প্রকল্প 'আশ্রয়' এবং 'আমার বাড়ী'। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় মূলত: গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই এই প্রকল্প রূপায়িত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যায় পাঠকদের কাছে এই দু'টি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হল।

আশ্রয় প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য জানুন

নং	প্রশ্ন	উত্তর
১)	আশ্রয় প্রকল্প কী?	দরিদ্র ও আর্থিক কারণে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত পরিবারের স্থায়ী আবাসন সুনিশ্চিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তরের প্রকল্প হল আশ্রয়। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এই প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা (Nodal Agency) হিসাবে কাজ করছে।
২)	গ্রাম পঞ্চায়েত আশ্রয় প্রকল্পের উপভোক্তা হিসাবে কাদের চিহ্নিত করবে?	এই প্রকল্পে উপভোক্তা হিসাবে বিবেচিত হবেন- ক) অসহায় ও নিরাশ্রয় মহিলা ও পুরুষ। খ) অসহায় বিধবা মহিলা যার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান নেই। গ) পাচারে শিকার হওয়া মহিলা। ঘ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। ঙ) বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তি। - যার/যাদের বাড়ী তৈরি করবার জন্য নিজস্ব জমি আছে এবং পরিবারটি দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী নাও হতে পারে, কিন্তু সেই তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আছে এমন পরিবার। এই শর্তাবলী পূরণ করছে এমন ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে গ্রাম পঞ্চায়েত ৫টি করে পরিবার উপভোক্তা হিসাবে নির্বাচিত করবে। তালিকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
৩)	জেলা পরিষদ স্তরে আশ্রয় যোজনার উপভোক্তা নির্বাচনের মানদন্ড কী হবে?	● প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বা অন্যান্য গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে গৃহহীন পরিবার এবং ● প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গৃহহীন পরিবার এই মানদন্ডের ভিত্তিতে সমস্ত জেলা পরিষদ মিলিয়ে মোট ৩২৪৫টি উপভোক্তা পরিবার নির্বাচিত হবে।
৪)	আশ্রয় যোজনার বাড়ী কে বা কারা তৈরি করবেন? বাড়ী তৈরির নিয়ম কী?	উপভোক্তার নিজস্ব জমি থাকতে হবে। উপভোক্তা পরিবারের লোকজন নিজেরাই বাড়ী তৈরি করবেন। উপভোক্তা জমি পাট্টা হিসাবে পেয়ে থাকতে পারেন, সরকারি জমি পেতে পারেন বা পাট্টা পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন, উপভোক্তার জমি যেন বাস্তুজমি যোগ্য হয়। কারুর ব্যক্তিগত জমিতে উপভোক্তা থাকলে অন্তত: ১৫ বছর সেই জমিতে থাকতে হবে, জমির মালিকের লিখিত অনুমোদন সহ।
৫)	এই যোজনার আওতায় গৃহ কার নামে হবে?	পরিবারের মহিলার নামে, পরিবারের কর্ত্রীর নামে গৃহ নথিভুক্ত হবে। যদি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা পরিবারে না থাকেন সেক্ষেত্রে ওই পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের নামে বাড়ীটি নথিভুক্ত হবে।
৬)	গৃহ নির্মাণের জন্য কত টাকা দেওয়া হবে এবং ক'টি কিস্তিতে দেওয়া হবে?	নতুন গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধারণ এলাকায় ৩৫,০০০ টাকা, সুন্দরবন ও পার্বত্য এলাকায় ৩৮,৫০০ টাকা বরাদ্দ হবে। মোট টাকা দু'টি কিস্তিতে উপভোক্তাকে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে। সুতরাং এই প্রকল্পে সমস্ত উপভোক্তাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ কর্মীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বন্টন করা হবে ইন্দিরা আবাস যোজনার নিয়ম অনুযায়ী।
৭)	আশ্রয় প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করার নিয়ম কী?	গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চিহ্নিত উপভোক্তাকে অর্থ বরাদ্দ করবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি। জেলা পরিষদ দ্বারা চিহ্নিত উপভোক্তাদের অর্থ বরাদ্দ করবে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে।
৮)	আশ্রয় প্রকল্পে বাড়ী তৈরির নিয়ম কী?	আশ্রয় প্রকল্পে নির্মিত বাড়ীটির পরিমাপ হতে হবে অন্তত: ২০ বর্গ মিটার বা ২১৫ বর্গ ফুট। বাড়ীটিতে থাকবে পর্যাপ্ত জায়গা, রান্নাঘর, বাতাস চলাচলের জায়গা, শৌচাগার, ধূমহীন চূলা এবং বাড়ীর ধরন হবে পাকা যাতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট না হয়।
৯)	নব নির্মিত গৃহটি যে আশ্রয় প্রকল্পাধীন তা কী করে বোঝা যাবে?	● বাড়ী তৈরির কাজ দু'বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে। বাড়ীর দেওয়ালে বা বোর্ডে উপভোক্তার নাম, ঠিকানা, যোজনার নাম অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও তৈরির বছর লিখতে হবে।
১০)	আশ্রয় যোজনার তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য ভান্ডার তৈরির জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?	● গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই যোজনার প্রত্যেক উপভোক্তার বাড়ী গিয়ে সমস্ত বাড়ীগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলের সম্পদ কর্মীগণ। ● প্রথম দফার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে আশ্রয় যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর এবং দ্বিতীয় দফার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে বাড়ীগুলি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর। ● গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দু'জন সম্পদ কর্মী ১০০শতাংশ বাড়ী পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতকে। ● প্রত্যেক সম্পদ কর্মী পরিবার পিছু প্রথম দফার তথ্য সংগ্রহের পর ১০ টাকা করে পাবেন এবং দ্বিতীয় দফার তথ্য সংগ্রহের পর আরও ১০ টাকা করে পাবেন। ● তাদের কাছ থেকে এই অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়ার পর পঞ্চায়েত সমিতি সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। এই অর্থ দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তথ্য ভান্ডার পরিচালনার জন্য নির্ধারিত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।
১১)	আশ্রয় যোজনার তদারকির জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?	জেলা, সাব-ডিভিশন ও ব্লকের আধিকারিকগণ পরিদর্শনের মাধ্যমে আশ্রয় প্রকল্পের তদারকি করবেন।

এরপর চারের পাতায়

একটি মানবিক আবেদন

আগামী ৬ই আগষ্ট দিনটি ভারতে 'অঙ্গ দান দিবস' রূপে পালিত হবে। মানুষের মৃত্যুর পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ দান করে অন্যের জীবন বাঁচানো যায়। আমাদের দেশে প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়ার কারণে কয়েক হাজার মানুষের জীবন হানি ঘটে। অথচ মৃত মানুষের অঙ্গ দিয়ে এই সমস্ত মানুষের মূল্যবান জীবন রক্ষা করা যায়। সচেতনতার অভাবে ভারতে মৃত্যুর পর অঙ্গ দানের কর্মসূচি তেমন কোন সাফল্য পায়নি। মৃত্যুর পরে আমরা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সহ মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে ফেলি। কিন্তু এই সমস্ত মৃত ব্যক্তির অঙ্গ দানের মাধ্যমে আমরা বহু মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি। আসুন, সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা 'মানুষের জন্য মানুষ', 'জীবনের জন্য জীবন' এই অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে আগামী ৬ই আগষ্ট 'অঙ্গ দান দিবস'কে সফল করে তুলি।

তিনের পাতার পর...

আমার বাড়ী সম্পর্কিত তথ্য জানুন

নং	প্রশ্ন	উত্তর
১)	'আমার বাড়ী' প্রকল্পের উপভোক্তা কারা হতে পারেন?	পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী - ক) গ্রামীণ/আধা-শহুরে (মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা নয়) এলাকার দরিদ্র পরিবার। খ) বন্যা/মাটিক্ষয়/দুর্যোগ প্রবণ এলাকার দরিদ্র পরিবার। গ) সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে প্রভাবিত দরিদ্র পরিবার (পুনর্বাসনের উদ্যোগ হিসাবে)। - দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষরাই অগ্রাধিকার পাবেন। - যোগ্য পরিবারের মাসিক আয় ৬০০০/- (ছয় হাজার) টাকার বেশি হবে না।
২)	এই প্রকল্পে গৃহ নির্মাণের জন্য কত টাকার প্রকল্প হবে?	রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের ১০০% ব্যয় ভার বহন করবেন। এই প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি বাড়ী তৈরির জন্য অনুমোদিত বরাদ্দ হল:- ক) গ্রামীণ অঞ্চলে সমতল এলাকায় বসবাসকারী উপভোক্তা পাবেন- ১,১৬,০০০ টাকা (এক লাখ ষোল হাজার টাকা)। খ) সাধারণ এলাকায় (তটবর্তী এলাকা নয়) বসবাসকারী মৎস্যজীবী উপভোক্তা পাবেন - ৮৩,০০০ টাকা (তিরাশি হাজার টাকা)। এটি মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। গ) সুন্দরবনের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী উপভোক্তা পাবেন- ১.৩২,০০০ টাকা (এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা)। এটি রূপায়ণ করে বন দপ্তর। ঘ) তটবর্তী এলাকা কিন্তু বনাঞ্চল নয়, এমন এলাকায় বসবাসকারী উপভোক্তারাও পাবেন - ১,৩২,০০০ টাকা (এক লাখ বত্রিশ হাজার টাকা)। এটি রূপায়ণ করে মৎস্য দপ্তর ও সুন্দরবন সম্বন্ধীয় দপ্তর। ঙ) দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় এবং বনাঞ্চলের গ্রামগুলিতে বসবাসকারী উপভোক্তা পাবেন - ১,৭৫,০০০ (এক লাখ পচাত্তর হাজার টাকা)। এটি রূপায়ণ করে বন দপ্তর। চ) জলপাইগুড়ি জেলার বনাঞ্চলের গ্রামগুলিতে বসবাসকারী উপভোক্তা পাবেন ১,৯৭,০০০ টাকা (এক লাখ সাতানব্বই হাজার টাকা)। এটি রূপায়ণ করে বন দপ্তর। ছ) আধা-শহুরে অঞ্চলে সমতল এলাকায় বসবাসকারী উপভোক্তার নিজস্ব জমিতে একতলা নতুন বাড়ী তৈরির জন্য পাবেন - ১,১৬,০০০ (এক লাখ ষোল হাজার টাকা)। ❖ যদি প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা উপভোক্তাদের জমিতে নতুন বহুতল বাড়ী তৈরি করে দেয় তবে প্রতি বাসগৃহ পিছু খরচ পড়বে প্রায় ২,৫৩,০০০ টাকা (দু'লাখ তিপান্ন হাজার টাকা)।এই প্রকল্প থেকে শুধু নতুন বাড়ী তৈরি করে দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে উপভোক্তাকেই।
৩)	এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্য কী শর্ত রয়েছে?	বাড়ী তৈরি করার জন্য উপভোক্তার নিজস্ব জমি/পাট্টা পাওয়া জমি থাকতে হবে। ওই জমির উপর কারও দখল থাকা চলবে না। যদি কোনও জায়গায় উপভোক্তাদের জমি না থাকে তাহলে ওই এলাকার উপভোক্তাদের জন্য প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা জমির ব্যবস্থা করে তাতে ২/৩/৪ তলা বাড়ী তৈরি করে (যে জমিতে প্রযুক্তিগতভাবে যত তলা বাড়ী তৈরি করা সম্ভব) দিতে পারে।
৪)	এই প্রকল্পে উপভোক্তা নির্বাচনের পদ্ধতি কী?	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের সাথে আলোচনা করে মহকুমা শাসক 'আমার বাড়ী' প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকা ও আধা-শহুরে এলাকার একতলা বাড়ীর জন্য উপভোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করবেন। এই তালিকা তৈরির বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন জেলাশাসক। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা/এজেন্সির আধিকারিকগণ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক এবং মহকুমা শাসকদের সাথে আলোচনা করে নেবেন। উপভোক্তা চিহ্নিতকরণের জন্য এপিক কার্ড (ভোটার কার্ড) বা এই ধরনের অন্য কোনও নথি লাগবে। ইন্দিরা আবাস যোজনা/আশ্রয় প্রকল্প থেকে যারা সাহায্য পেয়ে গেছেন, তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না। জেলা স্তরে জেলা শাসক এই প্রকল্পটির তদারকির দায়িত্বে আছেন।
৫)	গৃহ নির্মাণের কী কোনও নির্দিষ্ট মাপ আছে?	নতুন তৈরি করা গৃহটি অবশ্যই পাকা হবে, ঘরের ভিতরের পরিমাপ হবে ১৫ বর্গ মিটার বা ২৭০ বর্গ ফুট। গ্রামীণ এলাকায় রূপায়ণকারী সংস্থা বা এজেন্সিগুলি অন্য যে সরকারি স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প আছে তার সাথে মিলে প্রতিটি বাড়ীতে কম দামের শৌচাগারের ব্যবস্থা করবে।
৬)	উপভোক্তাকে কীভাবে এই অর্থ বরাদ্দ করা হবে?	এই প্রকল্পে উপভোক্তাকে কোনও অর্থ নগদে বা চেকে দেওয়া হবে না। রূপায়ণকারী সংস্থা/এজেন্সির আধিকারিকগণ সরাসরি মহকুমা শাসক ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের মাধ্যমে উপভোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করে বাড়ী তৈরি করে দেবেন।

ন্যাশনাল স্কুল গেম্‌সে কাঠমিস্ত্রির মেয়ে সোমা ছিনিয়ে আনল রুপো

নাসিরুদ্দীন গাজী: ভাঙা ঘরে যেন চাঁদের আলো। কাঠমিস্ত্রীর মেয়ে পেল জাতীয় সাফল্য। ৫৮ তম ন্যাশনাল স্কুল গেম্‌সে অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগের হাইজাম্পে রুপো পেল পুরুলিয়া জেলার সোমা কর্মকার। পরিবারের আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এই সাফল্য মেলায় খুদে অ্যাথলিটকে বাহবা জানাচ্ছে সকলে। পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে মাঙ্গুরিয়া গ্রামে সোমার বাড়ি। ঘরে ঢুকলেই দারিদ্রের চেহারাটা ভীষণভাবে চোখে পড়ে। টালির ঘরের একাংশ ভাঙা। আর সেই ভাঙা ঘরের ফাঁক দিয়ে জল পড়ে, রোদ ঢোকে। এই অবস্থাতেই দিন কাটে সোমাদের। কাঠমিস্ত্রী বাবা প্রভাস কর্মকার দিনরাত পরিশ্রম করে সংসার চালান। সোমার মা ফেলু কর্মকার বলেন, তিন ছেলে-মেয়ের টানাটানির সংসারে লেখাপড়াই কার্যত বিলাসিতা। সেখানে আবার অ্যাথলেটিক! বড় অ্যাথলেটিক হওয়ার স্বপ্ন দেখা সোমার কাছে সব দিক থেকে অর্থই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবুও মনের জোর আর জেদকে সম্বল করে এগিয়ে যেতে থাকে সোমা। বেলগুমা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের এই ছাত্রী হাইজাম্পে একের পর এক সাফল্য নিয়ে আসতে থাকে। জেলা, রাজ্যের পর এবার জাতীয় স্তরে সাফল্য পেল সোমা। ঘরে এল আরেকটি মেডেল।

কিন্তু, এই ভাঙা ঘরে মেডেলই যেন বেমানান। দীর্ঘ সাফল্যের উপকরণ সাজিয়ে রাখবে কোথায় সেটাই বুঝতে পারে না সোমা। সাফল্যের শংসাপত্র কাটে উইপোকায়। মেডেল গড়াগড়ি যায় মেঝেতে। তবুও লক্ষ্যে এগিয়ে যায় সে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা পড়শিরা তার ক্রীড়া ক্ষেত্রের সাফল্যে তাকে বলে চাঁদের টুকরো, অনেকে বলেন, 'এ তো ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো'। এই ভাঙা ঘরে থেকেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে সোমা।

সোমার কথায়, 'এই সাফল্যকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেতে চাই। এই সাফল্য তো আমার স্বপ্ন পূরণের প্রেরণা।' ব্লক, মহকুমা, জেলা, রাজ্য- একের পর এক স্তর অতিক্রম করে জাতীয় স্তরে রুপো অর্জন করা চাট্টিখানি কথা নয়, যেখানে সোমাকে প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। স্কুল গেমস্

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কাঁথা স্টিচ প্রশিক্ষণ

বেবী বাউরী: সংসারে বাড়তি অর্থ রোজগারের লক্ষ্যে মহিলাদের কাঁথা স্টিচের প্রশিক্ষণ চলছে পুরুলিয়া জেলার মধুকুন্ডাস্থিত 'দিশা' প্রোজেক্ট অফিসে। ছ'মাসের এই প্রশিক্ষণটি শুরু হয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। চলবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। লোক কল্যাণ পরিষদ ও এ সি সি লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ৬ মাসের কাঁথা স্টিচের প্রশিক্ষণে দু'টি ব্যাচের ৪০ জন মহিলাদের হাতে-কলমে কাঁথা স্টিচের কাজ শেখানো হবে।

স্বনির্ভর দলের ৪০ জন মহিলা ইতিমধ্যে রুমাল তৈরি, ব্লাউজ তৈরি সম্পূর্ণ করেছেন। মহিলাদের প্রশিক্ষণ পর্বের হাতের কাজ দেখতে উৎসাহী মানুষরা ভিড় করছেন। ইতিমধ্যে, এ সি সি সিমেন্টের মনোজ জিন্দাল সাহেব, এনাক্ষী গুহ, সৈকত রায়, এস আই পি আর ডি'র সিনিয়র ফ্যাকাল্টি সুস্মিতা চৌধুরী, সাঁতুড়ী ব্লকের মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক (ডাব্লু ডি ও) বন্দনা দেবী, জননী সংঘের এক দল সদস্যা কাঁথা স্টিচের কাজ পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের

এরপর পাঁচের পাতায়

সবুজের সমারোহ ঘটাতে সবুজ মঞ্চের ব্যর্থতা

যৌথ মঞ্চ, যৌথ উদ্যোগ, যৌথ কর্মসূচি-স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাছে এগুলি অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। সাধারণ মানুষের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে সমাধানের প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেতে সবাই মিলে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলাটা জরুরী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণের তাগিদে যৌথ মঞ্চ গড়ে উঠলেও তা ভেঙে যায় সংকীর্ণ মানসিকতার কবলে পড়ে। চোখে পড়ে বিভিন্ন সংগঠনের একযোগে কাজ করার ক্ষেত্রে উদারতার অভাবও। চারদিকে সবুজের সমারোহ ঘটার আগেই সবুজ মঞ্চের বিপর্যয়ের কথা লিখেছেন ***জয়ন্ত দাস****।*

পরিবেশের স্বার্থে একসাথে লড়াইয়ে সামিল হওয়ার কথা বলে বাহবা কুড়ায় পরিবেশবাদীরা। বাস্তবে এক মঞ্চে আসার উদারতা দেখাতে পারে না। অতীতে বেশ কিছু পরিবেশ সচেতন মানুষের উদ্যোগে এরকম যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধেলড়াইয়ের চেষ্টা হলেও মঞ্চের নেতৃত্ব কোন সংগঠনের হাতে থাকবে সেই লড়াইয়ে প্রতিবারই হেরে যায় পরিবেশ আন্দোলন। অকাল মৃত্যু ঘটে একটি মহান উদ্যোগের। ২০০৯ সালের ২৩ মে জন্ম হয়েছিল এমনই একটি যৌথ মঞ্চের, যার উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা। তাই এই মঞ্চের নাম দেওয়া হয় সবুজ মঞ্চ। অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টসের সভাঘরে সবুজ মঞ্চের ভূমিষ্ট হওয়া উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতীতে অকালমৃত্যু হওয়া যৌথ মঞ্চের কারিগরেরা। ছিলেন বর্তমান উদ্যোমীরাও।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর সবুজ মঞ্চের জন্মের পরিপ্রেক্ষিত ব্যক্ত করেন এনভায়রনমেন্ট গভর্নড ইন্টিগ্রেটেড অর্গানাইজেশনের জয়ন্ত বসু। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে বহু সংস্থা অত্যন্ত দায়িত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশের প্রশ্নে কাজ করলেও তারা সকলেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ সময়ের দাবি ও প্রয়োজনে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে। সব সময় না হলেও অন্তত: বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রী বসু আরও বলেন, 'সবুজ মঞ্চ' ১০০ শতাংশ অরাজনৈতিক ও সামাজিক মঞ্চ। এটি আলাদা কোনো সংগঠন নয়। এটি বিধিমুক্ত নেটওয়ার্ক। তাই এই মঞ্চে প্রথাগত কোনো চাঁদা রাখার ভাবনা নেই। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়াতে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর এক সভায় 'সবুজ মঞ্চ'র সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময় বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা ছাড়াও এই প্রস্তাবের অংশীদার সংগঠন হিসাবে উদ্যোগী হয়েছিল কাঁচড়াপাড়ার বিজ্ঞান দরবার, চন্দননগরের পরিবেশ অ্যাকাদেমী, কোলকাতার এনভায়রনমেন্টগভর্নড ইন্টিগ্রেটেড অর্গানাইজেশন, কোলকাতার সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যালায়েড রির্সাচ, কোলকাতার সোনার বাংলা বিজ্ঞান সঞ্চার ও গবেষণা সমিতি এবং চুঁচুড়ার ইউ এন্ড আই ফাউন্ডেশন। জয়ন্ত বসু বলেন, প্রদীপের সলতে পাকানোর কাজটা এই সংগঠনগুলো করলেও আজকের সভায় আগত সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপরেই নির্ভর করবে 'সবুজ মঞ্চে'র ভবিষ্যৎ। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ বলেন, সবুজ মঞ্চের কর্মসূচির মধ্যে একটা শহুরে টান আছে। গ্রাম বাংলার চাহিদা মেনে কৃষিতে রাসায়নিক দূষণের মতো বিষয়গুলি কর্মসূচিতে আনতে হবে। পরিবেশকর্মী মোহিত রায় বলেন, কোলকাতার জলাশয়গুলি ক্রমশ: ভরাট হচ্ছে। ন্যাটমো'র সাম্প্রতিক মানচিত্রে ৮৩০০ জলাশয়ের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে কতগুলোর বাস্তব অস্তিত্ব আছে তা চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে।

নাগরিক মঞ্চের নব দত্ত বলেন, ১৯৯২-৯৩ সালে প্রায় ৩৬টি সংগঠনের উদ্যোগে ক্যালকাটা-৩৬ নামে একটি যৌথ মঞ্চ বেশ কয়েক বছর চলার পর সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তাই বর্তমান মঞ্চের কারিগরদের সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের যৌথ মঞ্চের সদস্য সংগঠনগুলো নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে মঞ্চের যৌথ কর্মসূচি অনেক সময়ই মার খায়।

হাওড়ার গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির সুভাষ দত্তবলেন, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে আমাদের উদ্যোগগুলো বিচ্ছিন্ন বলেই আমরা প্রায়শই হুমকির মুখে পড়ি। তাই

এরপর ছয়ের পাতায়

'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে জমির সন্ধানে টাস্ক ফোর্স

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রামে অন্যের জমিতে বা সরকারি জমিতে যে সব কৃষি মজুর, হস্ত শিল্পী, মৎস্য চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক পরিবার বসবাস করছেন তাদের জমির স্বত্ব বা মালিকানা দেওয়ার সুপারিশ করল মুখ্যমন্ত্রী তথা ভূমি মন্ত্রীর গঠিত টাস্ক ফোর্স। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হল, বর্তমান বছরের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত তাদেরকে টানা ১২ বছরের বেশি এই জমিতে বসবাস করতে হবে। তবেই তারা দখলিস্বত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ টাস্কফোর্স তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। টাস্ক ফোর্সের মতে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে যে বিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে যা আর তাদের কাজে লাগবে না। এমন জমিতে বহু পরিবারও বসবাস করছেন।

'নিজ গৃহ নিজ ভূমি'প্রকল্পে সরকার ভূমিহীন পরিবারকে তিন কাঠা করে জমি দেওয়ার যে সুপারিশ করেছেন এই সমস্ত জমি সেই প্রকল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে টাস্ক ফোর্সের অভিমত। কারণ 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করতে গৃহহীন পরিবারগুলিকে তিন কাঠা করে জমি দেওয়ার মত যথেষ্ট জমি সরকারের হাতে নেই। আবার জমি কিনে বিলি করার সুযোগও সীমিত। কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে যারা ১২ বছরের বেশি বসবাস করছেন তাদের সেই জমির পাট্টা দিলে বাস্তবে 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্পটি সফল করে তোলা সম্ভব হবে। আইনিভাবে পাট্টা দেওয়ার পর এই সমস্ত পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনার আওতায় এনে বাড়ী তৈরির কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গৃহহীন মানুষের জন্য স্থায়ী বসবাসের জায়গার সংস্থান করতে পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত পরিবারকে দশ কাটা করে জমি দেওয়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের হাতে উপযুক্ত খাস জমি না থাকায় এক লপ্তে জমি কিনে একসাথে অনেক পরিবারকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার এই প্রকল্পে বর্তমান বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৫৭ হাজার পরিবারকে পরিবার পিছু ৩ কাটা করে জমি দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করেছেন। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার হিসেব অনুসারে এ রাজ্যে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ। এখনও সরকারকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ গৃহহীন পরিবারের জন্য জমির বন্দোবস্ত করতে হবে।

প্রথম পাতার পর...

গরীবের নতুন সংজ্ঞা

হিসেবের এই বিতর্কিত পদ্ধতি নিয়ে আগেও বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। এই অবাস্তব হিসেব বিতর্কিত সুরেশ তেন্ডুলকর পদ্ধতি মেনে করা। এই পদ্ধতির ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বরা তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং অহলুওয়ালিয়াও মনে করেন, দারিদ্র নির্ধারণে এই আয়ের হিসেব যথাযথ নয়। তিনি জানান, হিসেবের নতুন পদ্ধতি স্থির করার জন্য সি রঙ্গরাজনের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছে আগামী বছরের মাঝামাঝি নাগাদ তার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত গরীবরা কি এই তথ্যের ফাঁদে পড়ে বঞ্চনার বোঝা বইতে থাকবে?

যোজনা কমিশনের হিসেব অনুসারে ভারতে ২০০৪-০৫ সালে গরীব মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০ কোটি ৭০ লক্ষ। ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা ২৭ কোটিতে নেমে আসে। অর্থাৎ বছরে প্রায় ২ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে এসেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। ভারতে ২০০৪-০৫ সালে যেখানে গ্রাম ও শহরে গরীব মানুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১.৮ ও ২৫.৭ শতাংশ সেখানে ২০১১-১২ সালে এই সংখ্যা গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে ২৫.৭ ও ১৩.৭ শতাংশ নেমে এসেছে।

সরকারি তথ্য পরিসংখ্যান যাই থাক না কেন, স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও শহরের বস্তি এলাকায় ও গ্রামে কাজ করতে গিয়ে দারিদ্র পীড়িত পরিবার দেখে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনেক সমাজকর্মীই আঁতকে উঠেন। আমাদের দেশে নিয়ম মেনে প্রকৃতই সঠিক বি পি এল তালিকা তৈরি হয়েছে এমন দাবী কোন শাসক দলের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। দারিদ্র যে কি জিনিস তা একমাত্র ভুক্তভোগী পরিবারগুলিই জানেন।

প্রথম পাতার পর...

জয়ী হল জলাভূমি

২০০১ সালে মানবাধিকার সংগঠন এ পি ডি আর এর স্থানীয় কর্মীরা জলা ভরাট বন্ধের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি জানান। ১৯৮৬ এর পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৫৫এর রাজ্যের ভূমি আইন এবং ১৯৮৪ এর ইনল্যান্ড ফিশারীজ অ্যাক্ট অনুসারে ৫ কাঠার বেশি যে কোনও ধরনের জলা ভরাট নিষিদ্ধ। এধরনের বেআইনি কাজকে জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, আইনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন বা পুরসভা কোন পক্ষই জলা ভরাট বন্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

অবশেষে মৎস্য দপ্তর এগিয়ে এসে জলা ভরাটের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ জারী করে। আইন অনুসারে জলাভূমির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার ব্যাপারেও বিজ্ঞপ্তি জারী করে। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চোরাগোপ্তা জলা ভরাটের কাজ চালিয়ে জলাটিকে প্রায় বন্ধ করে ফেলা হয়। অন্য কোন উপায় না দেখে মানবাধিকার সংগঠনের স্থানীয় কর্মীরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর অবশেষে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ভরাট অংশ খুলে জলাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মৎস্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন। পরিবেশ কর্মীদের এই জয় পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষ।

চারের পাতার পর...

ন্যাশনাল স্কুল গেম্‌স

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে জাতীয় স্তরে এই প্রতিযোগিতা উত্তরপ্রদেশের লখনৌতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ৪.৮৪ মিটার লাফিয়ে ওই মেডেল পায় সোমা। সোমার এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নুরুদ্দিন হালদার বলেন, সোমা আমাদের গর্ব। আমরা চাই ও এগিয়ে যাক, ওর লম্ফন আরও দীর্ঘ হোক। প্রশিক্ষক বাসুদেব মাহাতো বলেন, আরও একটু দূরে ঝাঁপ দাও, আর একটু দূরে, আরও দূরে। দীর্ঘ ঝাঁপানোর আশা শেষ হয় না সোমার। কারণ, চোখের সামনে ভাসতে থাকা গন্তব্যের কঠিন পথ যে এখনও অনেক দূরে।

চারের পাতার পর...

কাঁথা স্টিচ প্রশিক্ষণ

রান সেলাই, গুঁটি সেলাই, জিরিবান সেলাই, জিকজাক সেলাই, আগু ফোঁড় সেলাই, কাটা 'ব' সেলাই, চেলি সেলাই, চেন সেলাই, কাঁথা ফুল সেলাই, প্রদীপ সেলাই, মাছি ফোড় সেলাই, ডাল সেলাই সহ মোট ২৮ ধরনের সেলাই শেখানো হবে।

চাষবাসের কথা

সুপ্তী-পানু-সিদ্ধেশ্বরীরা স্বপ্ন দেখেন দিন বদলের

ভাগ্যবতী দাস: বীরভূম জেলার মল্লারপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন অনুন্নত একটি গ্রামের গরীব পরিবারে স্বামী,ছেলেমেয়ে নিয়ে সুপ্তী মালের সংসার। খুবই দু:স্থ পরিবার। সুপ্তী মালএকটি মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যা। মল্লারপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নঈসুভা'র উদ্যোগে এই দলটি তৈরি হয়েছিল। সুপ্তী মাল গোপনে এই দলের সদস্যা হন, কারণ তার স্বামী দল করা,মহিলাদের বাইরে যাওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। এমনকি,বাড়িতে দল সম্বন্ধে কোনো আলোচনাও করা যেত না। মিটিং এ গেলে প্রচন্ড মারধোর করতেন, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে দরজা বন্ধ করে সারারাত বাইরে রেখে দিতেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর একদিন সুপ্তী মাল স্বামীর হাতে অত্যাচারিত হয়ে দলনেত্রীর বাড়িতে এসে সব কথা খুলে বললেন। তখন 'নঈসুভা'র পরামর্শে দলটির মাসিক সভা ডাকা হল সুপ্তী মালের বাড়িতে। সুপ্তী মাল ঘরদোর পরিষ্কার করে সভার অপেক্ষায় বসে আছেন এমন সময় তার স্বামী জানতে পারেন যে তার বাড়িতে দলের সভা ডাকা হয়েছে এবং 'নঈসুভা'র সম্পাদক মহাশয় সেখানে আসবেন। স্বামী অতিস মাল রেগেমেগে পরিষ্কার ঘরদোরে জল ঢেলে বসার জায়গাটা ভিজিয়ে দিলেন যাতে দলের সদস্যরা বসতে না পারেন। এমনকি, সভা ডাকার অপরাধে সুপ্তী মালকে সেদিন যথেষ্ট অত্যাচার সহ্য করতে হল। এই ঘটনার ছ'মাস পর তার মেয়ে অনামিকার বিয়ে ঠিক হল। বহু কষ্টে অতিস মাল অল্প কিছু টাকা যোগাড় করলেন। বাকি টাকা যোগাড় করতে না পারায় বিয়ে ভাঙার মত অবস্থা তৈরি হল। এমন সময় সুপ্তী মাল স্বামীকে বললেন যে, সে ৫০০০ টাকা বিয়েতে খরচ করার জন্য যোগাড় করতে পারবে। এটি তিনি দলের নির্দেশেই বলেছিলেন।

এই কথা শোনার পর অতিস মাল পাড়াশুদ্ধ রটিয়ে দিলেন যে তার স্ত্রীর নাকি চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে এবং সে টাকা রোজগারের জন্য খারাপ পথে নেমেছে। গ্রামের কয়েকজন চক্রান্তকারী লোকের কথা শুনে শেষ পর্যন্ত অতিস মাল তার শেষ সম্বল ১০ কাঠা ধানের জমি বন্দক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সুপ্তী মাল এই কথা শুনে স্বামীর নিকট খুব কান্নাকাটি করে বললেন দলের সঞ্চয় থেকে ৫০০০ টাকা ধার হিসেবে নেবেন এবং কিস্তিতে ফেরৎ দেবেন। এত কথা বলেও অতিস মালকে বোঝানো গেল না। নোংরা পথের রোজগারে বিয়ে দিলে তার মেয়ে সুখী হবে না -প্রভৃতি নানা কুকথা বলে সুপ্তীকে অপমান করতে শুরু করলেন। এই অবস্থায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার একজন কর্মীকে নিয়ে দলের সদস্যরা অতিস মালকে বারবার বোঝানোর পর অতিস মাল ভাবলেন, দেখা যাক না টাকাটা নিয়ে কি হয়? এইভাবে ৫০০০ টাকা দল থেকে তুলে সুপ্তী মালকে দেওয়া হল। তাছাড়া বিয়েতে সকল সদস্যা সব রকম ভাবে সাহায্য করলেন। বিয়ের একমাস পর অতিস মাল নিজে দলের কিস্তির টাকা ফেরৎ দিতে গিয়ে বললেন, পরের স্বনির্ভর দলের সভাটা যেন তার বাড়িতে হয়। এরপর থেকে অতিস মাল তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বনির্ভর দলের প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকতেন। স্বনির্ভর দলের কথা নিজেই পাড়ার লোকেদের বোঝাতে লাগলেন, নতুন দল গঠন করার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এইভাবে এক বছরের মধ্যে সুপ্তী মালের সংসার সুখে ভরে গেল। সুপ্তী মাল অত্যাচারিত হয়েও থেমে থাকেননি বলেই একটা সুন্দর পরিবার গড়ে তুলতে পেরেছেন। পানু মন্ডল এই গ্রামেরই এক গরীব পরিবারের মহিলা। স্বামী, বৃদ্ধা শ্বাশুড়ি ও দুই মেয়ে নিয়ে তার সংসার। নিজেই দলনেত্রী হয়ে একটি দল গঠন করেছিলেন। তার স্বামী মদ জুয়ায় আসক্ত ছিলেন। রোজগারের প্রায় সব টাকাই মদ জুয়ায় নষ্ট করে দিতেন। যেদিন জুয়ায় হেরে যেতেন সেদিন মদ খেয়ে বাড়িতে প্রচন্ড অশান্তি করতেন, ভাঙচুর চালাতেন,তরকারি পছন্দ না হলে ভাতের থালা ফেলে দিতেন, তারপর আবার নিজেই মদ বা জুয়ার ঠেকে গিয়ে বসতেন। এই ছিল তার জীবনের রোজনামচা। বাড়ির টাকাপয়সা, থালাবাটি হাতের সামনে যা পেতেন নিয়ে পালাতেন। বাক্সে তালা দিলে মারধোর করে তালা ভেঙে ফেলতেন। শাড়ি কাপড় নিয়ে বেচে দিতেন। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ি বুঝতে না পেরে ছেলের বৌকে গালি দিতেন, পুড়িয়ে মারার হুমকি দিতেন। পানু মন্ডল কিন্তু ছাড়ার পাত্রী নন। স্বেচ্ছসেবী সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ সহ জুটের কাজের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বাড়িতে অন্যান্য মেয়েদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলেন। তাদের তৈরি মালপত্র সংস্থার মাধ্যমে বিক্রি হতে লাগল। সেলাইএর মাধ্যমে যে টাকা আয় হত তার থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে শুরু করলেন পানু মন্ডল। জমানো টাকায়এক বিঘা ধানের জমি কিনলেন, বাড়িতে হাঁস, মুরগি, ছাগল, গাই-গরু পুষে ভালই লাভ হল। স্বামী বুপিন মন্ডল মদ খাওয়া বন্ধ করলেন না, বরং মদ খাওয়ার জন্য হাঁস মুরগি বেচতে শুরু করলেন। একদিন স্বনির্ভর দলের সব মেয়েরা মিলে মদ-জুয়ার ঠেকগুলি ভেঙে দিলেন। কারণ এতে যে গ্রমের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে , সেটা তারা বুঝতে পারলেন। এইভাবে বারকয়েক ভাঙচুর চালাবার পর মদ জুয়ার ঠেকগুলি বন্ধ করতে স্বনির্ভর দলের সদস্যরা পুলিশেরও সাহায্য পেলেন। এই সব দেখে বুপিন মন্ডল মদ-জুয়ার ঠেকে যাওয়া বন্ধ করে বাড়ির কাজে মন দিলেন। গরু বাছুর নিয়ে মাঠে যাওয়া, গরুর দুধ বিক্রি করা এখন তার প্রতিদিনের কাজ। পানুর মেয়েরা এখন স্কুলে যায়। বাড়িতে এখন আরও চারটি গরু পুষে আর্থিক সমৃদ্ধি বেড়েছে। সংসারেও শান্তি ফিরেছে।

এই গ্রামেরই গরীব পরিবারের একজন সহজ সরল মহিলা সিদ্ধেশ্বরী দাস । তার জীবনের সবচেয়ে বড় মূলধন হল সততা । স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সংসার । নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নঈসুভা'র মাধ্যমে স্বনির্ভর দল তৈরি করেন ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় প্রায় সাত বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে প্রশিক্ষণ বিষয়ক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন সিদ্ধেশ্বরী। ব্লকের পক্ষ থেকে তাকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। সৎ প্রচেষ্টা ও সততার গুণে সিদ্ধেশ্বরীর ভাগ্যের চাকাও ঘুরতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে তার জীবনে। একশ' দিনের কাজে 'সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ করতে পারে দলের মহিলাদের' তার এমন একটি কথার ভুল ব্যাখ্যা করে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই মর্মে প্রচার করে যে গ্রামে ১০০দিনের কাজ বন্ধ করতে চায় সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরীর নামে পঞ্চায়েতেও এ ব্যপারে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। একশ' দিনের কাজে কর্মরত মজুরদের ক্ষেপিয়ে তুলে তাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়। এমনকি,মারধোরের অভিযোগ এনে তার ছেলেকেও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। জীবনে এতখানি বিপর্যস্ত হয়েও সিদ্ধেশ্বরী অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছেন। সততাকে মূলধন করে চলার পথে সিদ্ধেশ্বরী আজ মল্লারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকলের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। নতুন সমাজ গড়ার পথে মহিলাদের একজোট হওয়াকেই বড় শক্তি বলে মনে করেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী।

প্রথম পাতার পর...

তেল ব্যবহারে সতর্কতা

মহিলাদের জন্য ৫ টাকা। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী বরাদ্দকৃত মাথাপিছু টাকার অংক কম বলে মনে করেন উপভোক্তা ও তাদের অভিভাবকরা। এ ব্যাপারে জেলাগত বিভাজনও তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যে ১লক্ষ ১৩ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৬৯ লক্ষ শিশু এবং ১৩ লক্ষ সন্তান-সম্ভবা মহিলারা একবেলা খাবার পান। খরচের ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করে থাকে।

পাঁচের পাতার পর ....

সবুজের সমারোহ ঘটাতে

আমি 'সবুজ মঞ্চে'র উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফুলিয়ার আশাবরী সংস্থা এবং হাওড়ার মাতৃ ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্তব্য করেন যে এইরকম উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামের ছোটো সংগঠনগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কাটস এবং ডাব্লু ডাব্লু এফ এই উদ্যোগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সামিল করার প্রস্তাব দেন। পরিবেশ অ্যাকাদেমীর বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, যে কোনো সরকারি সংস্থাকে এই উদ্যোগের সঙ্গে সামিল করার বাস্তব সমস্যা রয়েছে। কোনো কোনো সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিরুদ্ধেও মঞ্চকে আন্দোলন করতে হতে পারে। সোনার বাংলা বিজ্ঞান সঞ্চার ও গবেষণা সমিতির ড: সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় জানান,অনেক সংস্থার মিলিত মঞ্চ বা সমন্বয়কারী সংগঠনকে রেজিস্টার্ড করার কোনো সংস্থান এ রাজ্যের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে নেই। তাই বিধিমুক্ত সংস্থা হিসাবেই এই মঞ্চ পরিবেশের স্বার্থে কাজ করে যাবে। বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের সম্পাদক সুরেশ কুন্ডু বলেন, এই উদ্যোগের সঙ্গে ইকোক্লাব বা সবুজ বাহিনীর মতো রাজ্যভিত্তিক নেটওয়ার্ককে জুড়ে নিতে হবে। সবুজ মঞ্চের উদ্যোক্তাদের পক্ষে একটি সনদ প্রকাশ করে সংগঠনগুলোর কাছে পাঠাতে হবে। তাদের মতামত পাওয়ার পর একটি কনভেনশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে মঞ্চের কাজ শুরু হবে। অবশ্য এর পরে সবুজ মঞ্চের কর্মসূচি হালে পানি পায় নি। বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় পরিবেশ দপ্তর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে চাকরিসূত্রে এবং জয়ন্ত বসু একটি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় যুক্ত থাকার সুবাদে বেশ কিছু কর্মসূচি বিচ্ছিন্ন ভাবে নেওয়া হলেও বাকি সদস্য সংগঠনগুলোর সদিচ্ছার অভাবে অকাল মৃত্যু হয় এই মহান উদ্যোগের। বর্তমানে এই উদ্যোগের রাশ কার হাতে থাকবে সেই লড়াইয়ে বরাবরের মতো হেরে গেছে একসুরে একসাথে পরিবেশের স্বার্থে কাজ করার মানসিকতা। সম্প্রতি নতুন নেতৃত্বের হাত ধরে ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে উঠেছে সবুজ মঞ্চ। গঠিত হয়েছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং নামে একটি বেসরকারি কমিশনও। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুনানি হয়েছে কমিশনের। আমরাও অপেক্ষায় আছি কোন পথে এগোতে চায় সবুজ মঞ্চ।

ডাল চাষে আয় বাড়ান

বার্তা প্রতিনিধি: ধান কাটার পর খালি জমি ফেলে না রেখে মসুর চাষে জোর দেওয়া যেতে পারে। খাঁটুনি কম, খরচ অল্প অথচ ভাল দাম পাওয়া যায় বাজারে। মসুর ডাল মূলত: প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেই পড়ে। ঠান্ডা ও শুস্ক আবহাওয়া মসুর চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

দোঁয়াশ ও বেলে দোঁয়াশ মাটিতে মসুরের ফলন ভালো হয়। এই চাষের মাটি তৈরির জন্য জমিতে ৫/৬ বার লাঙ্গল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমিতে কম্পোষ্ট ও রাসায়নিক সার দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি একরে নাইট্রোজেন ৮ কিলোগ্রাম, ফসফেট ১৬ কিলোগ্রাম, পটাশ ৮ কিলোগ্রাম এবং ডলোমাইট ৬-৮ কিলোগ্রাম দিতে হবে।

দু'রকম ভাবে মসুর ডালের চাষ করা যায়। ছড়িয়ে বুনলে বীজ লাগবে একর প্রতি ১২ থেকে ১৫ কিলো আর লাইন দিয়ে বুনলে লাগবে ৮-১০ কিলোগ্রাম।

তবে বীজ বোনার আগে শোধন করে নিলে রোগ পোকার আক্রমণ কম হয়।

শোধন পদ্ধতি: প্রথমে মসুর বীজকে ৮-১০ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে প্রতি কিলোগ্রামে ৩ গ্রাম করে থাইরাম মেশাতে হবে।

সম্পাদক- ফটিক সাড ● ● ●